ইউনিট ৪

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

ভূমিকা

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার অব্দে বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে। অশোকের রাজত্বকালে পুণ্ড্র জনপদ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্ত যুগে প্রায় সারা বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। গুপ্ত শাসনের অবসানের পর বাংলায় দুটো স্বাধীন রাজ্যের বিকাশ ঘটে। এদের একটি উত্তর-পশ্চিম বাংলার গৌড় রাজ্য। অপরটি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বঙ্গরাজ্য। এরপর প্রায় একশ বছরের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার পর পাল বংশ ক্ষমতায় আসে। পাল বংশের পতনের পর সেন বংশের রাজত্ব শুরু হয়। সেন বংশের রাজত্বের অবসানের পর বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ–

- ➔ পাঠ ১ : প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ
- ➔ পাঠ ২ : বাংলা নামের উৎপত্তি
- ➔ পাঠ ৩ : মৌর্য ও গুপ্ত শাসনামলে বাংলা
- ➔ পাঠ ৪ : পাল পূর্ব যুগে বাংলা
- ➔ পাঠ ৫ : পাল বংশের শাসনাধীনে বাংলা
- ➔ পাঠ ৬ : দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহ
- ➔ পাঠ ৭ : সেন বংশের শাসনাধীনে বাংলা

পাঠ-১ : প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর নাম বলতে পারবেন।
☞ প্রাচীন জনপদগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।

১.১ বাংলাদেশের প্রাচীন পরিচিতি

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বাংলাদেশে মানুষের বসবাস ছিল। প্রাচীনকালে 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' নামে একক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। এর বিভিন্ন অংশ তখন বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ অনেকগুলো ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অঞ্চলের শাসকেরা যার যার মতো শাসন করতেন। তাই অঞ্চলগুলো ছিল ছোট ছোট স্বাধীন দেশের মতো। বাংলার এ অঞ্চলগুলোর নাম দেওয়া হয় জনপদ।

বাংলাদেশে প্রাচীন জনপদের সীমা বা বিস্তার সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে প্রতিটি অঞ্চলের সীমা সব সময় একই রকম থাকেনি। কখনও কোন জনপদের সীমা বেড়েছে, আবার কখনও কমেছে। নিচে কয়েকটি জনপদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১.২ প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জনপদ

গৌড়

প্রাচীনকালে ঠিক কোথায় গৌড় জনপদটি গড়ে উঠেছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে গৌড় রাজ্য বলে একটি স্বাধীন রাজ্যের কথা জানা যায়, যার অবস্থান ষষ্ঠ শতকে পূর্ব বাংলার উত্তর অংশে ছিল। সপ্তম শতকে শশাঙ্ককে গৌড় রাজ বলা হতো। এ সময় গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় এর অবস্থান। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের কিছু আগে মালদহ জেলার লক্ষণাবতীকেও গৌড় বলা হতো। মুসলিম যুগেও এ অঞ্চল গৌড় নামে পরিচিত ছিল।

বঙ্গ

বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে বঙ্গ বলে একটি জাতি বাস করত। তাই জনপদটি পরিচিত হয় বঙ্গ নামে। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গে দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। একটি বিক্রমপুর আর অন্যটি নাব্য। বর্তমানে নাব্য বলে কোন জায়গার অস্তিত্ব নেই। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী অঞ্চল। বাংলায় মুসলিম শাসন বিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়েও 'বঙ্গ' বলে বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলকে বোঝানো হতো।

পুণ্ড্র

পুণ্ড্র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। বলা হয় যে, পুণ্ড্র বলে এক জাতি এ জনপদটি গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। পুণ্ড্র জনপদের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় পুণ্ড্রবর্ধন। পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লেখা এখানে পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশে এটি প্রাচীনতম শিলালিপি।

বরেন্দ্রী

বরেন্দ্রী, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রভূমি নামে আরেকটি জনপদের কথা জানা যায়। এটিও উত্তর বঙ্গেরই জনপদ। অনুমান করা হয়, পুণ্ড্ররই একটি অংশ জুড়ে বরেন্দ্রীর অবস্থান ছিল। বগুড়া ও রাজশাহী জেলার অনেকটা অঞ্চল ছিল বরেন্দ্রীর অন্তর্ভুক্ত।

সমতট

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের প্রতিবেশী জনপদ সমতটের অবস্থান। চীন দেশের পর্যটক হিউয়েন সাং সপ্তম শতকের মাঝামাঝিতে সমতট ভ্রমণ করে একটি বিবরণী লেখেন। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত প্রসারিত ভূ-ভাগ সমতটের অন্তর্গত ছিল বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালি অঞ্চল। বর্তমান কুমিল্লা জেলার লালমাই এলাকা ছিল এ অঞ্চলের মূল কেন্দ্র। অনেকে মনে করেন, কুমিল্লা জেলার বড় কামতা ছিল এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

হরিকেল

হরিকেল জনপদের অবস্থান ছিল পূর্ব ভারতের পূর্বপ্রান্তে। মনে করা হয়, আধুনিক সিলেটই হলো হরিকেল জনপদ। অবশ্য কেউ কেউ ধারণা করেন, হরিকেল আলাদা কোন জনপদ নয়। এটি বঙ্গ জনপদের সাথেই যুক্ত ছিল।

রাঢ়

রাঢ় জনপদ ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। এটি গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় নামে দুভাগে বিভক্ত ছিল রাঢ়দেশ। এর রাজধানী ছিল কোটীবর্ষ। রাঢ়ের এক বড় অংশ সুহ্ম নামেও পরিচিত ছিল। রাঢ়ের দক্ষিণে বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় 'তাম্রলিপ্তি' ও 'দণ্ডভুক্তি' নামে দুটি ছোট বিভাগ ছিল। বৌদ্ধ পুঁথি ও বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তৎকালে তাম্রলিপ্তি একটি বিখ্যাত নৌ-বাণিজ্য বন্দর ছিল।

অন্যান্য জনপদ

এছাড়া প্রাচীন বাংলায় আরো কয়েকটি জনপদের অস্তিত্বের কথা বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। এগুলোর মধ্যে তাম্রলিপ্তি (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তমলুক), চন্দ্রদ্বীপ (বর্তমান বরিশাল জেলার অন্তর্গত), বঙ্গাল (বাখেরগঞ্জ ও খুলনা জেলার সমুদ্র লাগোয়া অঞ্চল) উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে তাম্রলিপ্তি প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত নৌ-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল।

সার-সংক্ষেপ

প্রাচীনকালে পুরো বাংলা জুড়ে একক কোন রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। তাই 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' নামে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তখন ছিল না। অনেকগুলো ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এদেশ। প্রতিটি অঞ্চলের শাসকরা যার যার মতো করে শাসন করত। তাই অঞ্চলগুলো ছিল ছোট ছোট স্বাধীন দেশের মতো। কিন্তু এগুলোকে ঠিক রাজ্য বা রাষ্ট্র বলা যাবে না। বাংলার এই অঞ্চলগুলোকে তখন বলা হতো 'জনপদ'। এর অনেককাল পরে 'বাংলা' বলে একটি বড় দেশের জন্ম হয়েছিল। আর তার যাত্রা শুরু হয় এই জনপদগুলোর মধ্যদিয়ে। গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, রাঢ় প্রভৃতি জনপদের কথা জানা যায় প্রাচীন বইপত্রে। এসব জনপদের সীমা বা বিস্তার সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে প্রতিটি অঞ্চলের সীমা সব সময় একই রকম থাকেনি। কখনও কোন জনপদের সীমা বেড়েছে আবার কখনও কমেছে। ঐতিহাসিক তথ্য হতে প্রাচীন জনপদগুলোর মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.১

ক. নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর দিন :

১. কখন থেকে বাংলাদেশের মানুষের বসবাস ছিল?
২. প্রাচীনকালে 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' নামে একক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল কি?
৩. প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলগুলোর কি নাম দেওয়া হয়?
৪. গৌড় বলা হতো কোন অঞ্চলকে?
৫. বঙ্গ রাজ্যটির অবস্থান কোথায় ছিল?
৬. কোন অঞ্চল নিয়ে 'পুণ্ড্র জনপদ' পরিচিত ছিল?
৭. বরেন্দ্র অঞ্চল কোনটি?
৮. সপ্তম শতকের কোন চীনা পর্যটক এদেশে আসেন?
৯. সমতট জনপদ কোন অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত ছিল?
১০. হরিকেল জনপদটি কোথায় ছিল?
১১. 'রাঢ়' বলা হতো কোন অঞ্চলকে?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদের পরিচয় দিন?
২. নিম্নের জনপদগুলোর উপর টীকা লিখুন :
(ক) গৌড় (খ) বঙ্গ (গ) পুণ্ড্র (ঘ) সমতট (ঙ) রাঢ়।

পাঠ-২ : বাংলা নামের উৎপত্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আমাদের দেশটির নাম কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ কিভাবে এদেশের নামকরণ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.১ বাংলাদেশের ইতিবৃত্ত

আজকের বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে প্রাচীনকালে বলা হতো 'বাংলা'। তবে প্রাচীন যুগে এই সম্পূর্ণ দেশটির একক নাম বাংলা ছিল না। হিন্দু ও বৌদ্ধদের শাসনকালে এই দেশ অনেকগুলো অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি অংশের ছিল ভিন্ন ভিন্ন নাম। মধ্যযুগে যখন এদেশে মুসলমান শাসকদের অধিকারে আসে তখন থেকে দেখা যায় দেশটির নামের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছে। বাংলা ভাষায় কথা বলা লোকেরা যে অঞ্চলে বাস করত এসময়ে তারই নাম হয় বাংলা। মুসলমান শাসন যুগ অর্থাৎ মধ্য যুগের শুরুর দিকে মুসলিম শাসক ও ইতিহাস লেখকগণ 'বঙ্গ বা বাঙলা (বাংলা)' বলতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে বুঝাতেন। এ যুগের সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াসশাহ প্রথম পুরো বাংলাকে নিজের অধিকারে আনেন। ইতিহাস লেখকগণ তখন তাঁকে উপাধি দেন 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' এবং 'সুলতানই বাঙ্গালা'। এ সময় থেকেই পুরো দেশটি বাংলা নামে পরিচিত হয়। রাঢ় ও লক্ষণাবতীর (গৌড়) লোকেরা ইলিয়াস শাহের সময় থেকেই বাঙালি বলে পরিচিত হতে থাকে।

অনেককাল পরে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের অধিকারে চলে যায় এদেশ। ধীরে ধীরে পুরো ভারতের ক্ষমতা দখল করে ইংরেজরা। আমাদের এদশেটি ব্রিটিশদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ইংরেজরা তখন এই প্রদেশকে বলত 'বেঙ্গল'। বেঙ্গল নামটি ছিল ইংরেজি ভাষায় আর বাংলা ভাষায় বলা হতো বাংলাদেশ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো দেশের জন্ম হয়। এ সময় পূর্ব বাংলা হয়ে যায় পাকিস্তানের অংশ আর পশ্চিম বাংলা হয় ভারতের অংশ। পরে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত স্বতন্ত্র সত্তাগুলো ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বাধীন হওয়ার আকঙ্ক্ষায় ১৯৭১ এর ২৬ মার্চে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। তখন থেকে এদেশবাসী তাদের দেশেন নাম দেয় 'বাংলাদেশ'। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। তখন থেকে 'বাংলাদেশ' একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের নাম হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়।

২.২ বাংলা নামকরণ

মোগল সম্রাট আকবরের ইতিহাস লেখক আবুল ফজল বাংলা নামের উৎপত্তির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মতে এদেশের প্রাচীন নাম ছিল 'বঙ্গ'। এর আগে আমরা অবশ্য একটি ছোট জনপদ হিসেবে বঙ্গ নামক অঞ্চলের সাথে পরিচিত হয়েছি। আবুল ফজলের মতে প্রাচীনকালে এই বঙ্গ অঞ্চলের রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ চওড়া প্রকাণ্ড 'আল বা বাঁধ' নির্মাণ করতেন। এ থেকে বঙ্গ+আল=বঙ্গাল, বাঙ্গাল বা 'বাঙ্গালা' নাম হয়েছে। তবে একথা ঠিক মুসলিম আমলের পূর্বে 'বঙ্গ' ও বাঙ্গালা বাংলার অংশ বিশেষের নাম ছিল। আবুল ফজল সে সময়ের বাংলার একটি সীমা এঁকেছেন। তার মতে বাংলা চট্টগ্রাম থেকে রাজমহলের নিকট তেলিয়াগর্হি পর্যন্ত চারশত ক্রোশ লম্বা ছিল। পূর্ব ও উত্তর দিক ছিল পাহাড়ে ঘেরা। বাংলার দক্ষিণে ছিল সাগর আর পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। তখন প্রদেশগুলোর নাম হয় 'সুবা'। সুবা বাংলা তখনও চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগর্হি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রিটিশ শাসন যুগেও সীমারেখার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। তখন চট্টগ্রাম থেকে রাজমহল এবং হিমালয় পর্বত থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বাংলার বিস্তার ছিল। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত সিলেট জেলা ছিল আসামের সাথে যুক্ত। পরে তা আবার বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়।

সার-সংক্ষেপ

সেই প্রাচীনকালের শুরু থেকেই এদেশের নাম 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার আর বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা এক এক সময় এদেশ শাসন করেছে। এরই সাথে সাথে দেশটির নামে এসেছে বিভিন্ন পরিবর্তন। বিভিন্ন পরিবর্তনের পথ ধরে এদেশের নাম বাংলা বা বাংলাদেশ হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে বাংলাদেশের আকৃতি কেমন ছিল?
ক. একক রাষ্ট্র খ. দুটি অংশে বিভক্ত
গ. অনেকগুলো অংশে বিভক্ত ঘ. পাঁচটি অংশে বিভক্ত

২. পুরো বাংলাকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করেন কে?
ক. সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ খ. সম্রাট আকবর
গ. আবুল ফজল ঘ. সম্রাট জাহাঙ্গীর

৩. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর এদেশের কি নামকরণ করা হয়?
ক. পূর্ব বাংলা খ. পূর্ব পাকিস্তান
গ. বাংলাদেশ ঘ. বেঙ্গল

৪. বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রথমে ব্যাখ্যা কে করেন?
ক. ইলিয়াস শাহ খ. আবুল ফজল
গ. সম্রাট আকবর ঘ. সম্রাট জাহাঙ্গীর

৫. মোগল যুগে এদেশকে কি বলা হতো?
ক. সুবা খ. দেশ
গ. প্রদেশ ঘ. জনপদ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন কোন সময় 'বাংলা' নামের পরিবর্তন হয়ে কি কি নাম হয়েছে আলোচনা করুন।

২. 'বাংলা' নামটির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে বর্ণনা করুন।

পাঠ-৩ : মৌর্য ও গুপ্ত শাসনামলে বাংলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ মৌর্য শাসনামলে বাংলার অবস্থা বলতে পারবেন।

☞ গুপ্তযুগের বাংলার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১

বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের প্রসিদ্ধ দুটি রাজবংশের নাম মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশ। এ দুই রাজবংশের সময় বাংলার সার্বিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। নিম্নে মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের শাসনামলের বাংলার অবস্থার বিবরণ দেয়া হলো :

৩.২ মৌর্য শাসনামলে বাংলা

গ্রিক লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে বর্তমান বাংলাদেশ এলাকায় গঙ্গারিডই নামে সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। এ রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল গঙ্গা। এ সময়কালকে মৌর্য শাসনামল বলে ধারণা করা হয়। পণ্ডিতদের ধারণা হলো, 'গঙ্গারিডই' ছিল বর্তমানকালের বাংলা। আর্যদের আগমনের আগেই বাংলায় মৌর্য বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভারতে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় রাজা অশোকের সময়ে ২৬৯-২৩২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। বাংলা ছিল মৌর্যদের একটি প্রদেশ। এর রাজধানী ছিল প্রাচীন পুণ্ড্র নগর।

মৌর্য শাসনামলে বাংলার রাজা খুবই প্রতাপশালী ছিলেন। তার বিশাল সামরিক বাহিনীতে ৪ হাজার সুসজ্জিত হাতি ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, বিশাল হস্তী বাহিনীর ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর খবর শুনে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করেন।

মৌর্য শাসনামলে বাংলা ছিল ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজ্য। 'গঙ্গারিডই' (বাংলার পূর্বনাম) রাজ্যের রাজধানীতে সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় তৈরি হতো, যা সুদূর পশ্চিমা দেশে রপ্তানি হতো।

মৌর্য শাসনামলে বাংলার সীমানা বিস্তৃত হয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় প্রাচীন পুণ্ড্ররাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে উত্তরবঙ্গের এ অঞ্চল তখন মৌর্য শাসনাধীন একটা প্রদেশে পরিণত হয়।

৩.৩ গুপ্তযুগে বাংলা

গুপ্তযুগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান করতে পারেননি। আনুমানিক ৩২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্র এলাকা (বর্তমান পাটনায়) গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধারণা করা হয়, গুপ্ত সাম্রাজ্য বর্তমান পাটনা এলাকায়, যার তৎকালীন নাম পাটলীপুত্র। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, গুপ্ত বংশের আদি পুরুষেরা বাংলার পশ্চিমাংশে একটি ছোট রাজ্যের সামন্ত অধিপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলাই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনস্ত হয়।

গুপ্ত যুগে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করার মাধ্যমে শাসন করা হতো বলে জানা যায়। বাংলার উত্তরাংশ 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি' নামে একটি প্রদেশ অথবা প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে সংঘটিত হয়েছিল। গুপ্ত সম্রাটের নিযুক্ত একজন শাসনকর্তা দ্বারা এটি শাসিত হতো। ৫০৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বা সমতট শাসন করতেন। প্রথমে তিনি গুপ্ত সম্রাটের অধীনে একজন সামন্ত শাসনকর্তা ছিলেন। পরে সম্ভবত তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

গুপ্ত যুগের শাসনামলে বাংলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল। সে সময় বাংলাদেশে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। গুপ্ত শাসনাধীন বাংলাদেশ ছিল বেশ সমৃদ্ধ। ঐতিহাসিকদের মতামত বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, প্রাচীন বাংলা সমৃদ্ধশালী ছিল।

সার-সংক্ষেপ

আর্যদের আগমের আগেই বাংলায় মৌর্য বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভারতে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় রাজা অশোকের সময়। তখন এটা মৌর্যদের একটি প্রদেশ ছিল। তাদের সময়ে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমৃদ্ধ ও শান্তিময় ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

এক কথায়/এক বাক্য উত্তর লিখুন :

১. কোন সময়ে বাংলাদেশ এলাকায় 'গঙ্গারিডই' নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল?
২. কাদের আগমনের পূর্বেই বাংলায় মৌর্যদের রাজত্ব চলছিল?
৩. গ্রিক বীর আলেকজান্ডার কেন বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করেছিল?
৪. গুপ্ত রাজ্য কোন এলাকা নিয়ে ছিল?
৫. কোন যুগে বাংলাদেশে সোনা-রুপার মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মৌর্য শাসনামলের বাংলার অবস্থা লিখুন।
২. গুপ্ত বংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা কেমন ছিল?

পাঠ-৪ : পাল পূর্ব যুগে বাংলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ পাল পূর্ব যুগে বাংলার বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ স্বাধীন গৌড় রাজের বর্ণনা দিতে পারবেন।

৪.১ পাল পূর্ব যুগে বাংলা

ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধেই ভারতের বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। দুর্ধর্ষ পাহাড়ি জাতি হূনদের আক্রমণে টুকরো টুকরো হয়ে যায় গুপ্ত সাম্রাজ্য। এ সুযোগে সমগ্র উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজবংশের উদ্ভব হয়। এভাবে গুপ্ত পরবর্তীকালে সমস্ত উত্তর ভারতব্যাপী যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল, বাংলাতেও তার ঢেউ এসে লাগে। এ অস্থিতিশীলতার সুযোগে বাংলাদেশে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। এর একটি ছিল প্রাচীন 'বঙ্গরাষ্ট্র' এবং দ্বিতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম গৌড়রাজ্য।

৪.২ স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্র

গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গ জনপদে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যকে ঐতিহাসিকরা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য নামে আখ্যা দিয়েছেন। স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের প্রাচীন রাজারা তামার পাতে খোদাই করে বিভিন্ন ঘোষণা বা রাজকীয় নির্দেশ জারি করতেন। এগুলোকে বলা হতো তাম্র শাসন। স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের যুগে এরূপ সাতটি তাম্র শাসন পাওয়া গেছে। এসব থেকে জানা যায় যে, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব নামে তিনজন রাজা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য শাসন করেছেন। উল্লিখিত তিন রাজা ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেছিল। এক সময় বঙ্গ রাষ্ট্রের পতন ঘটে। ধারণা করা হয়, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশের রাজা কীর্তি বর্মণের হাতে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের পতন ঘটেছিল। তবে কারো কারো মতে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উত্থান ঘটলে বঙ্গরাজ্যের পতন ঘটে। স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের পতনের পেছনে কিছু সামন্ত রাজার উত্থানকেও দায়ী করা হয়। কারণ সপ্তম শতকের পূর্বেই দক্ষিণ বাংলার সমতট রাজ্যে ভদ্র, খড়্গ, রাঢ় প্রভৃতি বংশের স্বাধীন সামন্ত রাজাদের উত্থান ঘটেছিল।

৪.৩ স্বাধীন গৌড়রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে পরবর্তী গুপ্তবংশ নামে পরিচিত গুপ্ত উপাধি নেয়া রাজাগণ বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ ও মগধে ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। বিভিন্ন কারণে গুপ্ত বংশের রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে মগধে শশাঙ্ক নামক এক খ্যাতিমান শাসক গৌড় রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেন। প্রাথমিক যুগে শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত রাজ মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্ত। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের আগে কোন এক সময় তিনি গৌড়ের স্বাধীন নরপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাথমিক সময়ে স্বাধীন গৌড় রাষ্ট্রের রাজা শশাঙ্ক দণ্ডভুক্তি রাজ্য, উড়িষ্যার উৎকল ও কঙ্গোগ রাজ্য এবং বিহারের মগধ রাজ্য জয় করে তার রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। পশ্চিমে তার রাজ্য বারানসী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কামরূপ রাজারাও শশাঙ্কের হাতে পরাজিত হন।

এরপর শশাঙ্ক উত্তর ভারত জয়ের চিন্তা করেন। উত্তর ভারতে এ সময় দুটো শক্তিশালী রাজ্য ছিল। যথা—

১. একটি পুষ্যভূতি রাজবংশের অধীনস্থ থানেশ্বর।
২. অন্যটি মৌখরীরাজবংশের অধীনে কান্য কুব্জ (কনৌজ)।

শশাঙ্ক গুপ্তদের চিরশত্রু মৌখরীদের পরাজিত করার সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হন। এজন্য তিনি মালব রাজ দেবগুপ্তের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। শশাঙ্ক উত্তর ভারতে পৌছার আগেই দেবগুপ্তের হাতে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত হন।

দেবগুপ্ত এবার থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হন। সে সময় থানেশ্বরের রাজা ছিলেন রাজ্যবর্ধন। তিনি পথিমধ্যে দেবগুপ্তকে বাধা দেন। যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হন। এরপর রাজ্যবর্ধন কনৌজের দিকে অগ্রসর হলে শশাঙ্কের মুখোমুখি হন। যুদ্ধে শশাঙ্কের জয় হয়। রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে বন্দি হন। পরে তাকে হত্যা করা হয়।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যর পর থানেশ্বরের পরবর্তী অধিপতি হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি।

৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে শশাঙ্ক মৃত্যুবরণ করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ে কোন যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। এসময় পার্শ্ববর্তী রাজা হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের হাতে গৌড়রাজ্য ছিন্ন-

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাশাপাশি ভূ-স্বামীরা একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। বাংলার এই অরাজকতাপূর্ণ অবস্থাকে তাম্রশাসনে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়েছে।

এভাবে একশ বছর অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা চলার পর গৌড় রাজ্যের অরাজকতার অবসান ঘটে। ক্ষমতাসীন হয় পাল রাজবংশ।

ক্ষমতার বিবর্তনের ধারায় বাংলার ইতিহাস অগ্রসর হতে থাকে। শশাঙ্কের পর পর্যায়ক্রমে বাংলার ক্ষমতাসীন হন পাল রাজবংশ, সেন রাজবংশ ইত্যাদি। এভাবে এক পর্যায়ে ক্ষমতায় আবির্ভাব ঘটে মুসলিম শাসনের।

সার-সংক্ষেপ

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন এটিই বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন। এদেশবাসী ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, পশুপালন ও কারিগরি শিল্পে দক্ষ ছিল। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় গংগা তীরবর্তী অঞ্চলে গংগারিডই নামক একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পুণ্ড্রনগর ছিল এই প্রদেশের রাজধানী। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলে প্রায় সারা বাংলা গুপ্ত শাসনাধীনে ছিল। তখন বাংলা ছিল খুবই সমৃদ্ধশালী। গুপ্ত শাসনের অবসানের পর দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় বঙ্গ এবং পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় গৌড় নামক দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের উত্থান ঘটে। বঙ্গ রাজ্যের তিনজন সার্বভৌম রাজা ছিলেন- গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব। গৌড় রাজ শশাঙ্ক ছিলেন প্রাচীন বাংলার প্রথম শক্তিশালী রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। তাঁর আমলে বাংলার সামরিক শক্তির প্রভাব উত্তর ভারতেও অনুভূত হয়েছিল। উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়। শশাঙ্ক গৌড়ের সার্বভৌম ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সময় বাংলার সুখ-সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ন ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন :

১. কোন শতকে ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?
২. কাদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়?
৩. স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্র যুগের তিনজন রাজার নাম লিখুন।
৪. কোন রাজ্যের উত্থানে বঙ্গরাজ্যের পতন ঘটে?
৫. প্রাথমিক যুগে শশাঙ্ক কি ছিলেন?
৬. শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি?
৭. শশাঙ্কের রাজ্য পশ্চিমে কোন অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?
৮. কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়?
৯. বাংলার অরাজকতাপূর্ণ অবস্থাকে তাম্রশাসনে কি বলা হয়?
১০. বাংলার অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা কত বছর চলছিল?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাল পূর্ব যুগের স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্রের বিবরণ দিন।
২. পাল পূর্ব যুগের স্বাধীন গৌড় রাষ্ট্রের অবস্থা বর্ণনা করুন।

পাঠ-৫ : পাল বংশের শাসনাধীনে বাংলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ পাল রাজা গোপাল-এর শাসনকাল বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ ধর্মপালের শাসনকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ দেবপাল-এর শাসনামলের বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ প্রথম মহীপালের শাসনামলের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ রামপালের শাসনকাল বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ পাল বংশের পতন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১ পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

প্রাচীন বাংলার রাজবংশসমূহের তালিকায় পালবংশ বিখ্যাত একটি রাজবংশ। এই বংশই বাংলার সর্বপ্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ বলে ধারণা করা হয়। পাল রাজারা প্রায় চারশ বছর যাবৎ এদেশে রাজত্ব করেন। ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা গোপাল বাংলায় পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এক অরাজকতাপূর্ণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সামন্তরা গোপালকে ক্ষমতায় বসান। রাজা গোপালের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশই পাল বংশ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

৫.২ গোপাল (৭৫৬-৭৮১ খ্রি.)

পাল বংশের স্থপতি হলেন রাজা গোপাল। ৭৫৬ সালে গোপাল শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়ে ৭৮১ সাল পর্যন্ত ২৫ বছর যাবৎ রাজত্ব করেন। গোপাল বরেন্দ্র অঞ্চলের এক প্রভাবশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিল বপ্যট। গোপাল খ্যাতিমান যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ক্ষমতায় বসে শক্ত হাতে দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। ধীরে ধীরে সমস্ত অরাজকতার অবসান হয়। বাংলার উত্তর এবং পূর্ব অংশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা গোপাল অধিকার করতে পারেননি। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। গোপাল বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারে মনোযোগ দিয়েছিলেন।

৫.৩ ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রি.)

পিতার মৃত্যুর পর ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা ও বিহারে পাল শাসনের শক্ত ভিত্তি তৈরি করার কৃতিত্ব ধর্মপালের। এ সময় উত্তর ভারত অধিকার করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল তিনটি বংশ। একটি বাংলার পাল বংশ অন্যটি রাজপুতনার গুর্জর-প্রতীহার বংশ এবং তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশ। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' নামে পরিচিত।

ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ শুরু হয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে। প্রথম যুদ্ধ হয় ধর্মপাল ও প্রতীহার বংশের বৎসরাজের মধ্যে। এ যুদ্ধে পরাজিত হন ধর্মপাল। এর কিছুকাল পরেই দাক্ষিণাত্য থেকে এগিয়ে আসেন রাষ্ট্রকুট রাজা ধ্রুব ধারাবর্ষ। তিনি একে একে বৎসরাজ ও ধর্মপালকে পরাজিত করেন। ত্রিশক্তি সংঘর্ষে ধর্মপাল পরাজিত হলেও তার বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কারণ বিজয়ের পর রাষ্ট্রকুট রাজ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গিয়েছিলেন। ফলে ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করেন। তিনি বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করেছিলেন। তাঁকে উপাধি দেয়া হয় 'উত্তরাপথ স্বামী'। এই উপাধি ছিল যথার্থ। বাংলার আর কোন রাজ্য উত্তর ভারত জুড়ে ক্ষমতা বিস্তার করতে পারেননি। কোন কোন সূত্র মতে ধর্মপাল নেপালও জয় করেছিলেন। এর পরেও উত্তর ভারতে বৎসরাজ ও রাষ্ট্রকুট রাজদের সাথে যুদ্ধ করে ধর্মপালকে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হয়।

ধর্মপাল একদিকে যেমন ছিলেন বিজয়ী বীর অন্যদিকে তেমনি ছিলেন জনপ্রিয় শাসক। তাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্ব দিকে তিনি একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারটির নাম দেওয়া হয় বিক্রমশীল বিহার। ধর্মপালের দ্বিতীয় নাম বিক্রমশীল। এই নাম থেকেই বিহারটির নামকরণ হয়। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বৌদ্ধবিহারটিও ধর্মপাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নিজে বৌদ্ধ হলেও হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তিনি উদার ছিলেন। হিন্দু ধর্ম তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। একজন ব্রাহ্মণকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন। ধর্মপাল প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেন।

৫.৪ দেবপাল (৮২১-৮৬১ খ্রি.)

পিতার মৃত্যুর পর দেবপাল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। পিতার মতো তিনিও দক্ষতার সাথে রাজ্য বিস্তার করেন। উত্তর ভারতে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকুট রাজাদের সাথে যুদ্ধে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন তার দুই ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্র। উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চল তাঁর অধিকারে এসেছিল। উড়িষ্যা ও কামরূপ রাজার উপরও তিনি শক্তি প্রয়োগ করে সফল হয়েছিলেন। দেবপালের সময়েই পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়েছিল।

গোপাল অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে পাল রাজত্বের উত্থান ঘটিয়েছিলেন। ধর্মপাল ও দেবপাল এই সাম্রাজ্যের গৌরব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। বাংলার গৌরব উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে দেবপালের মৃত্যু হয়। তাঁর পর পাল সাম্রাজ্যে দুর্যোগ চলে একটানা দীর্ঘ দিন। ৮৬১ থেকে ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজত্ব করেন। এরা সবাই ছিলেন দুর্বল শাসক। তাঁদের দুর্বলতার কারণে পাল সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি হয়। উত্তর-পশ্চিম বাংলায় কাম্বোজ নামে এক রাজবংশের উত্থান ঘটে।

৫.৫ প্রথম বিগ্রহপাল (৮৬১-৯৮৯ খ্রি.)

দেবপালের মৃত্যুর পর প্রথম বিগ্রহপাল থেকে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল (৮৬১-৯৮৯) পর্যন্ত পাল রাজ্যকে বেশি দুর্বল দেখা যায়। প্রথম বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণ পাল দীর্ঘকাল (৮৬৬-৯২০) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এরপর একে একে পাল সিংহাসনে বসেন রাজ্যপাল (৯২০-৯৫২), দ্বিতীয় গোপাল এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপাল।

৫.৬ প্রথম মহীপাল (৯৯৫-১০৪৯ খ্রি.)

দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশের রাজত্বে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। রাজা **১**ম মহীপাল সেসব বিপর্যয় রোধ করে আনুমানিক ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় অর্ধশত বছর যাবৎ রাজত্ব করে পাল বংশের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি সুসংহত করার চেষ্টা করেন। **১০৪৩** সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র **১**ম মহীপাল পাল সাম্রাজ্যের গৌরব কিছুটা ফিরিয়ে আনেন। তিনি উত্তর ও পশ্চিম বাংলা থেকে কাম্বোজদেরকে বিতাড়িত করেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান শাসক। তাঁর শাসনামলে অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ সাধিত হয়। বাংলার অনেক কীর্তির সাথে **১**ম মহীপালের নাম জড়িয়ে রয়েছে। 'মহীপাল দিঘী', 'মহিশুর', 'মহীসন্তোষ', 'মহীপালের গীত' ইত্যাদি **১**ম মহীপালের কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

১ম মহীপালের মৃত্যুর পর যোগ্য শাসকের অভাবে অতি দ্রুত পাল সাম্রাজ্যের পতন হয়। পতন যুগের পাল রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের নাম উল্লেখযোগ্য।

৫.৭ দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০খ্রি.)

প্রথম মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নয়পাল ও পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল একে একে রাজা হন। তাঁদের দুর্বলতার সুযোগে বাইরের আক্রমণকারীরা বারবার আক্রমণ করে পাল সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তৃতীয় বিগ্রহপালের পর রাজা হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল। তাঁর সময় উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন দিব্যক। দিব্যক ছিলেন কৈবর্ত নেতা। এই জন্য এই বিদ্রোহ কৈবর্ত বিদ্রোহ বা বরেন্দ্র বিদ্রোহ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহীদের দমন করতে গিয়ে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দিব্যক বরেন্দ্র অঞ্চলের রাজা হন।

দ্বিতীয় মহীপালের পর রাজা হন তার ছোট ভাই শূরপাল। তিনি মাত্র দু'বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পর রাজা হন সর্বকনিষ্ঠ ভাই রামপাল।

৫.৮ রামপাল (১০৮২-১১২৪ খ্রি.)

রামপাল রাজা হয়েই বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। এই সময় কৈবর্তদের নেতা ছিলেন ভীম। প্রথম চেষ্টায় রামপাল ব্যর্থ হন। নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য রামপাল পার্শ্ববর্তী অনেক রাজার সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁর মামা রাষ্ট্রকুট রাজা মথন তাঁকে অর্থ, অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। যুদ্ধে ভীম পরাজিত ও বন্দি হন। পরে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বরেন্দ্র অঞ্চলের উপর রামপালের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে তিনি কামরূপ এবং উড়িষ্যার উপরও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিত" নামে রামপালের জীবনী লিখেন। তা থেকে আমরা রামপালের জীবনকথা জানতে পারি। তাঁর মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের গৌরব দ্রুত বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। রামপালকে পালবংশের শেষ 'মুকুটমণি' বলা যায়।

রামপালের পর কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল একে একে রাজা হন। তাঁরা সবাই ছিলেন শাসক হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল। যুদ্ধ-বিগ্রহে পাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অবশেষে সেনবংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে পাল রাজত্বের অবসান ঘটে।

৫.৯ পাল বংশের পতন

রাজা রামপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। অল্পদিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায় পাল রাজবংশ। সমাপ্ত হয় দীর্ঘ ৪শ বছরের পাল শাসন। এভাবে বাংলার ক্ষমতার মসনদে অন্য একটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবার পথ সৃষ্টি হয়ে যায়।

উত্থান আর পতন ইতিহাসের চিরন্তন ধারা। একদা মহাপ্রতাপে পাল রাজবংশ বাংলার মসনদে ক্ষমতাসীন হয়েছিল। অতঃপর ইতিহাসের অমোঘ ধারায় মিলিয়ে যায় তাদের রাজত্ব। পাল বংশের পতনের পর বাংলায় সেন বংশের উত্থান ঘটে।

সার-সংক্ষেপ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর বাংলায় অরাজকতা চলে। এই অরাজক অবস্থাকে বলা হয় 'মাৎস্যন্যায়'। গোপাল নামক একজন শক্তিশালী লোক এই অরাজকতার অবসান ঘটান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম পালবংশ। পালবংশের রাজারা প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করেন। এযুগে বাংলা একটি স্থিতিশীল ও ঐশ্বর্যশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময় উত্তর ভারতের আধিপত্য নিয়ে গুর্জর প্রতিহার, রাষ্ট্রকুট ও পালবংশের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি বাংলার শক্তিকে উত্তরভারত পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হন। ধর্মপালের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র দেবপাল। তাঁর শাসনামলে পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়। দেবপালের পর পাল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে পালবংশের গৌরব পুনরায় ফিরে আসে। কিন্তু তা ছিল স্বল্পস্থায়ী। দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্র অঞ্চলে কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। রামপাল কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করে বরেন্দ্র অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। তিনি পালবংশের শেষ মুকুটমণি। অবশেষে সেনবংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে পাল শাসনের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন :

১. মাৎস্যন্যায় কথাটির অর্থ কি?
ক. মাছের মতো খ. শান্তির যুগ
গ. অরাজকতা ঘ. যুদ্ধবিগ্রহ

২. কে মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটান?
ক. শশাঙ্ক খ. ভাস্করবর্মণ
গ. হর্ষবর্ধন ঘ. গোপাল

৩. কাকে 'উত্তরাপথ স্বামী' বলা হতো?
ক. গোপালকে খ. ধর্মপালকে
গ. দেবপালকে ঘ. প্রথম মহীপালকে

৪. সোমপুর বৌদ্ধ বিহার কে তৈরি করেন?
ক. শশাঙ্ক খ. ধর্মপাল
গ. দেবপাল ঘ. রামপাল

৫. পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কোন রাজবংশের উত্থান ঘটে?
ক. কাম্বোজ খ. চন্দেলা
গ. কলচুরি ঘ. রাষ্ট্রকুট

৬. কৈবর্ত বিদ্রোহ 'কার' নেতৃত্বে হয়?
ক. মথনের নেতৃত্বে খ. বিজয়সেনের নেতৃত্বে
গ. দিব্যকের নেতৃত্বে ঘ. দ্বিতীয় মহীপালের নেতৃত্বে

৭. রামচরিতের লেখক কে?
ক. সন্ধ্যাকর নন্দী খ. হলায়ুধ
গ. জয়দেব ঘ. বল্লালসেন

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

পিতার মৃত্যুর পর ধর্মপাল —— সিংহাসনে বসেন। পাল রাজাদের মধ্যে —— ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। —— ও —— পাল শাসনের শক্ত ভিত্তি তৈরি করার কৃতিত্ব ধর্মপালের। এ সময় উত্তর ভারত অধিকার করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল —— বংশ। একটি বাংলার পাল বংশ অন্যটি ——–——–—— বংশ এবং তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের —— বংশ। ইতিহাসে এই যুদ্ধ '——–——' নামে পরিচিত।

গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ধর্মপালের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।
২. শাসক হিসেবে দেবপালের মূল্যায়ন করুন।
৩. প্রথম মহীপালের শাসনামলের বর্ণনা দিন।
৪. রামপালের সময় কৈবর্ত রাজা কে ছিলেন? রামপাল কিভাবে তাঁকে দমন করেন?

পাঠ-৬ : দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ পাল রাজত্বের যুগে বাংলার স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ও অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

☞ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সমস্ত রাজবংশ গড়ে উঠেছিল, তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

৬.১ পাল রাজত্বের যুগ

পাল রাজারা বাংলা, বিহার থেকে শুরু করে উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলের উপর ক্ষমতা বিস্তার করলেও সমগ্র বাংলা সকল সময়ের জন্য তাঁদের অধিকারে রাখতে পারেননি। পাল যুগের বেশিরভাগ সময় জুড়েই বঙ্গ বলে পরিচিত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বিভিন্ন স্বাধীন রাজবংশের অধিকারে ছিল। অর্থাৎ গুপ্ত যুগের পর থেকে সেন বংশের উদ্ভব কাল পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা খুব অল্প সময়ের জন্যই উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার সাথে জড়িত ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে যে সকল রাজবংশ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

৬.২ খড়গ বংশ

সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন মগধ ও গৌড়ে পরবর্তী গুপ্ত বংশের রাজাগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখনই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন হয়। এই রাষ্ট্রের রাজাগণ ছিলেন খড়গ বংশের। খড়গদের রাজধানীর নাম কর্মান্ত-বাসক। এটি সম্ভবত কুমিল্লা জেলার 'বড়কামতার' প্রাচীন নাম। ত্রিপুরা ও নোয়াখালি অঞ্চলের উপর খড়গদের অধিকারে ছিল।

৬.৩ দেব বংশ

খড়গ বংশের শাসনের পর অষ্টম শতকের মাঝামাঝি একই অঞ্চলে দেববংশের উদ্ভব হয়। দেববংশের চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন- শ্রী শান্তিদেব, শ্রী বীরদেব, শ্রী আনন্দদেব ও শ্রী ভবদেব। রাজারা প্রত্যেকেই বড় বড় উপাধি নিয়ে প্রচার করতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা খুব শক্তিধর। এসব উপাধি হচ্ছে- পরম সৌগত, পরম ভট্টারক, পরমেশ্বর, মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি। শক্তিশালী দেব রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদের রাজধানী ছিল দেবপর্বতে। কুমিল্লার নিকট ময়নামতির দক্ষিণে ছিল এই দেবপর্বত। সমগ্র সমতট অঞ্চল জুড়ে দেবরাজাদের রাজত্ব ছিল। দেবরাজা আনন্দের রাজধানীতে 'আনন্দবিহার' বলে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করা হয়। আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেবরাজাদেব শাসন চালু থাকে।

৬.৪ কান্তিদেবের স্বাধীন রাজ্য

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি অংশ ছিল হরিকেল। এখানে কান্তিদেব নামে এক রাজা নবম শতকে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। কান্তিদেবের পিতার নাম ধনদত্ত ও পিতামহের নাম ভদ্রদত্ত। সিলেট কান্তিদেবের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজ্যটির রাজধানীর নাম বর্ধমানপুর। বর্ধমানপুর ঠিক কোথায় তা এখন নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। কান্তিদেবের বংশের অন্য পুরুষদের কথা জানা যায় না। তবে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। কান্তিদেব বা তাঁর বংশের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয় চন্দ্রবংশ। এ থেকে ধারণা করা হয়, দেববংশ ও চন্দ্রবংশের মাঝামাঝি সময়ে কান্তিদেব ও তাঁর বংশধরেরা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেন।

৬.৫ চন্দ্র রাজবংশ

পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় সবচেয়ে শক্তিধর রাজবংশ হচ্ছে চন্দ্রবংশ। খ্রিস্টীয় দশম শতকের শুরুতেই চন্দ্রবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড়শ বছর এই বংশ শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই বংশের প্রথম শক্তিধর রাজার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়কে সে যুগে বলা হতো রোহিতাগিরি। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পিতা ছিলেন সুবর্ণচন্দ্র এবং পিতামহ ছিলেন পূর্ণচন্দ্র। চন্দ্রবংশের রাজাদের ধর্মও ছিল বৌদ্ধ। শক্তিধর ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল দখল করেছিলেন। এই সাথে তিনি চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল ও এর চারপাশের অঞ্চল) জয় করেন। একে একে তাঁর অধিকারে আসে বঙ্গ ও সমতট। ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রায় ত্রিশ বছর (আনুমানিক ৯০০-৯৩০ খ্রি.) শাসন করেন।

পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন শ্রীচন্দ্র। শ্রীচন্দ্র বংশের গৌরব আরও বৃদ্ধি করেন। তিনি বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে রাজধানী গড়ে তোলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'পরমেশ্বর' 'পরম ভট্টারক' 'মহারাজাধিরাজ'। পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ছাড়াও শ্রীচন্দ্র উত্তর-পূর্বে কামরূপ ও উত্তরে গৌড়ের উপরও শক্তি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীচন্দ্র প্রায় পয়ঁতাল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। (আনুমানিক ৯৩০-৯৭৫ খ্রি.) এর পর সিংহাসনে বসেন শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্র (আনুমানিক ৯৭৫-১০০০

খ্রি.)। কল্যাণচন্দ্রের সময় চন্দ্রবংশের গৌরব অক্ষুণ্ন ছিল। কল্যাণচন্দ্রের পুত্র লড়হচন্দ্রের রাজত্বকালেও (আনুমানিক ১০৪৫-১০২০ খ্রি.) এই গৌরব ম্লান হয়নি।

শেষ চন্দ্ররাজা ছিলেন গৌবিন্দচন্দ্র। তিনি লড়হচন্দ্রের পুত্র। তাঁর রাজত্বকালে (আনুমানিক ১০২০-১০৪৫ খ্রি.) বাইরের আক্রমণের আঘাত আসে। চোল সম্রাট রাজেন্দ্রচোল ও কলচুরিরাজ কর্ণ বঙ্গ আক্রমণ করলে চন্দ্রবংশের পতন হয়।

৬.৬ বর্ম রাজবংশ

একাদশ শতকের শেষ দিকে পাল শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল; তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্ম বলে এক রাজবংশের উত্থান ঘটে। ধারণা করা হয় কলচুরিরাজ কর্ণের সাথে বর্মরা এসেছিল। বর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা। উত্তর বাংলায় যখন দিব্যকের নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ চলছিল, তখন তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। জাতবর্মার পর পুত্র হরিবর্মা রাজা হন। তিনি একটানা ৪৬ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। পাল রাজাদের সাথে তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা করে নাগাভূমি ও আসাম পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তৃত করেন। হরিবর্মার পর তার এক পুত্র রাজা হলেও এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। এরপর একে একে ক্ষমতায় বসেন সামলবর্মা ও ভোজবর্মা। এর পরই বর্ম রাজবংশের পতন হয়। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সেনবংশের রাজা বিজয়সেন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা দখল করেন।

সার-সংক্ষেপ

গুপ্ত যুগের পর থেকে শুরু করে সেন রাজত্বের সূচনাকাল পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় জুড়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা স্বাধীন ছিল। এখানে বেশকিছু রাজবংশ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। এগুলোর মধ্যে খড়্গবংশ, দেববংশ, কান্তিদেবের রাজ্য, চন্দ্রবংশ ও বর্মবংশের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। কোন কোন রাজবংশ বেশ শক্তিশালী ছিল। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সেনবংশের রাজা বিজয়সেন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা দখল করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৬

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন :

১. কর্মান্ত-বসাক কি?
ক. দেবরাজার নাম খ. খড়্গদের রাজধানী গ. একটি স্বাধীন রাজ্য ঘ. ময়নামতির একটি পাহাড়

২. আনন্দ বিহার কোন বংশের রাজত্বকালে নির্মিত হয়?
ক. খড়্গবংশ খ. দেববংশ গ. চন্দ্রবংশ ঘ. বর্মবংশ

৩. দেবপর্বত কোথায় অবস্থিত?
ক. গৌড়ে খ. বরেন্দ্রে গ. সিলেটে ঘ. কুমিল্লায়

৪. চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
ক. সুবর্ণচন্দ্র খ. পূর্ণচন্দ্র গ. শ্রীচন্দ্র ঘ. ত্রৈলোক্যচন্দ্র

৫. রোহিতগিরি কি?
ক. লালমাই পাহাড় খ. দেবপর্বত গ. চন্দ্রদ্বীপ ঘ. হরিকেল

৬. শেষ চন্দ্র রাজার নাম কি ছিল?
ক. লড়হচন্দ্র খ. কল্যাণচন্দ্র গ. শ্রীচন্দ্র ঘ. গোবিন্দচন্দ্র

৭. বর্মরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
ক. বজ্রবর্মা খ. জাতবর্মা গ. হরিবর্মা ঘ. ভোজবর্মা

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেববংশের শাসনকাল আলোচনা করুন।
২. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্র রাজাদের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ-৭ : সেন বংশের শাসনাধীনে বাংলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ সেন বংশের পরিচয় বলতে পারবেন।
☞ বিজয় সেনের রাজত্বকাল বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ বল্লাল সেনের রাজত্বকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ সেন বংশের পতন সম্বন্ধে আলোকপাত করতে পারবেন।

৭.১ পরিচয়

ক্ষমতা দখলের পালাবদলের ধারাবাহিকতায় বাংলার মসনদে আগমন ঘটেছিল সেন বংশের। সেনরা সুদূর দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে এদেশে আসেন। পাল বংশের শেষ রাজা মদন পালের অযোগ্যতার ফলে দেশে দেখা দেয় অরাজকতা এবং সেন বংশের আবির্ভাবে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর বাংলার সামন্তচক্রের বিদ্রোহের কারণে সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। তাদের দুর্বলতার সুযোগে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন ধীরে ধীরে ক্ষমতা সুসংহত করেন। পাল সম্রাট মদন পালের রাজত্বকালে সেন বংশ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়।

৭.২ বিজয় সেনের রাজত্বকাল (১০৯৮-১১৬০ খ্রি.)

১০৯৮ সালে বিজয় সেন সিংহাসন লাভ করেন। সিংহাসন লাভের পর বিজয় সেন নিম্নলিখিত বিজয় অভিযানসমূহ পরিচালনা করেন :

বিজয় সেন শূর বংশীয় রাজকন্যা বিলাস দেবীকে বিবাহ করেন। এ সময় রাঢ় ছিল শূর বংশীয়দের অধীনে। বিজয় সেন বিবাহের ফলে রাঢ় এলাকায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান।

রাঢ় দখলের পর বিজয় সেন বর্মবংশীয় রাজাকে পরাজিত করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেন।

পাল রাজা মদন পালের শাসনামলে বিজয় সেন উত্তর-পশ্চিম বাংলা আক্রমণ করে সেখানে আপন প্রভুত্ব কায়েম করেন।

বিজয় সেন ছিলেন বীরযোদ্ধা। তিনি কামরূপরাজ, কলিঙ্গরাজ ও মিথিলার নান্যদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এভাবে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে বিজয় সেন প্রায় সমগ্র বাংলায় বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে বিজয় সেন মৃত্যুবরণ করেন। বিজয় সেন ছিলেন শৈব ধর্মের অনুসারী। শৈবধর্ম হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা। তিনি বেশ কিছু উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। যেমন- 'পরম মাহেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, অরিরাজ নিশঙ্ক শঙ্কর' ইত্যাদি। তার প্রথম রাজধানী ছিল হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে এবং দ্বিতীয় রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে।

৭.৩ বল্লাল সেনের রাজত্বকাল (১১৬০-১১৭৮ খ্রি.)

বিজয় সেনের পর ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লাল সেনও ছিলেন পিতার মতো দক্ষ যোদ্ধা। যোগ্যতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা করতে থাকেন তিনি।

রাজ্য বিস্তার

সিংহাসনে আরোহণের পর রাজা বল্লাল সেন রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি মগধ ও মিথিলা জয় করেন। তার শাসনামলে সমগ্র বাংলাদেশের ওপর সেন বংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন

রাজা বল্লাল সেন বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দু'খানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তিনি এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি শৈবধর্ম প্রচারের বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি 'অরিরাজ নিশঙ্ক শঙ্কর' উপাধিও গ্রহণ করেন। শৈবধর্ম প্রচারের জন্য তিনি আরাকান, কামরূপ, নেপাল, উড়িষ্যা ও মগধে দূত পাঠান। তাঁর রাজত্বকালে সূফী বাবা আদম শহীদ ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। বল্লাল সেনের সাথে রাজধানী বিক্রমপুরে সূফীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সূফী শহীদ হয়েছিলেন। শেষ বয়সে তিনি পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হাতে রাজত্বের ভার ছেড়ে দিয়ে ধর্ম সাধনায় দিন কাটান।

রাজা বল্লাল সেন পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। জ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসেবেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৮ বছর কাল রাজত্ব করেছিলেন।

৭.৪ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল (১১৭৮-১২০৬ খ্রি.)

রাজা লক্ষ্মণ সেন তার পিতার পর ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সেন বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন অনেকগুলো বিজয় অভিযান পরিচালনা করে তার রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। তিনি গৌড়, কলিঙ্গ ও কামরূপ রাজাদেরকে পরাজিত করেন। কাশী ও প্রয়াগ জয় করে তিনি সেখানে একটি বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

পিতার মতো লক্ষ্মণ সেন একজন সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তিনি তার পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুত সাগর' সমাপ্ত করেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মিলনস্থল ছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলায়ুদ তার প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ লক্ষ্মণ সেনের দানশীলতা ও অন্যান্য গুণাবলীর প্রশংসা করেন।

৭.৫ সেন বংশের পতন

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলিম শক্তি উত্তর ভারত থেকে বাংলার দিকে অগ্রসর হয়। বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্মণ সেন দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়ায় বসবাস করছিলেন। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করেন।

নদীয়ায় পরাজিত হয়ে লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে আসেন পূর্ব বাংলায়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা মুসলিম অধিকারে চলে যায়। লক্ষ্মণ সেন আরো দু'বছর রাজত্ব করে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। যদিও এর পরে আরো কিছুকাল পূর্ব বাংলায় সেন শাসন চলছিল, তবুও বলা চলে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটে।

সার-সংক্ষেপ

প্রাচীন বাংলার শেষ শক্তিশালী রাজবংশ ছিল সেনবংশ। বাংলা ও বাংলার বাইরের কিছু অংশ অধিকার করে সেন রাজারা এক বিরাট রাজত্ব গড়ে তুলেছিলেন। সুদূর কর্ণাট থেকে এসে এই ব্রহ্মা-ক্ষত্রিয় রাজারা পাল রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে এদেশে সেন শাসনের সূত্রপাত করেছিলেন। বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের মাধ্যমে সেন শাসনের গৌরব বিকশিত হয়। শুধু রাজ্য শাসনেই নয়, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে সেনদের যথেষ্ট সুনাম ছিল। দীর্ঘদিন শাসন করার পর ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলমান শক্তির হাতে সেনদের পতন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৭

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন :

১. সেনরা কোথা থেকে এদেশে এসেছিল?
২. সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি?
৩. বিজয়সেন শূর বংশীয় কোন রাজকন্যাকে বিয়ে করেন?
৪. কার আমলে উত্তর-পশ্চিম বাংলায় সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫. বিজয়সেনের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল?
৬. বিজয়সেন কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
৭. কার শাসনামলে সমগ্র বাংলাদেশ সেন রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়?
৮. বল্লালসেনের দুটি গ্রন্থের নাম কি লিখুন?
৯. বল্লালসেনের সাথে কোন সূফীর যুদ্ধ হয়?
১০. বল্লালসেন কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
১১. নদীয়া কোন রাজার রাজধানী ছিল?
১২. লক্ষ্মণসেন কার কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে পূর্ব বাংলায় আসেন?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সেন বংশের পরিচয় দিন।
২. বিজয়সেন সম্বন্ধে টীকা লিখুন।
৩. বল্লালসেনের রাজত্বকালের বিবরণ দিন।
৪. লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের বিবরণ দিন।
৫. সেন বংশের পতনের কথা লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৪

বিশদ উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহের বিবরণ দিন।
২. বাংলা নামের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত লিখুন।
৩. মৌর্য ও গুপ্ত শাসনামলে বাংলার অবস্থা বর্ণনা করুন।
৪. পাল-পূর্ব যুগে বাংলার বিবরণ দিন।
৫. পাল বংশের শাসনামলে বাংলার অবস্থা বর্ণনা করুন।
৬. গোপাল ও ধর্মপালের রাজত্বকাল বর্ণনা করুন।
৭. দেবপাল, প্রথম মহীপাল, দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের রাজত্বকালের বিবরণ দিন।
৮. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহের বিবরণ দিন।
৯. বিজয়সেন, বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের বর্ণনা দিন।